*International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)*
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 35-42*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8**

# চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের খাদ্যাভাস এবং অর্থনৈতিক বিভাজন: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

**শিল্পা মণ্ডল**
*পিএইচডি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত*

**Abstract:**
*"Mangalkavya" is one of the important texts in medieval literature. Apart from Persian literature, this is also an indispensable source for constructing the early-medieval and medieval history. This literature gives us a clear idea about the "Society", "Economy" and "Gender Relations" in Medieval Bengal. Different scholars defined these cultural texts in various manners. Some complementary to each other whereas some contradict each other. Whatever the explanation of the mangal poems, it is significant part of the oral and the written traditions. The previous works regarding "Mangalkavya", deal with literary expression of it and the greatness of deities. But the main concern of this article is to differentiate the food habits of Bengali people on the basis of Chandimangal Kavya. Kabikankan Mukundaram composed the text of "Candimangalkavya" around late sixteenth century. "Candimangalkavya" constructed the story of "Chandi" and "Kalketu-Fullara" and "Dhanapati-Khullana-Lahana". After that, Dwija Madhab and Manik Dutta also focused on the protagonist characters of Chandimangal Kavya. From this article, I want to explain the diversity of Bengali Cuisine from regional perspectives. Not only that, but this article also wants to address different economic class on the behalf of food habits using Nidya (hunter's wife) and Khullana (Merchant wife). Furthermore, tries to explain the food culture of rich and poor people within the same class with the change in economic condition.*

***Keywords: Chandimangal kavya, Food habits, Bengali Cuisine, Economic conditions, Rich and Poor.***

খাদ্যচর্চায় ভোজনপ্রিয় বাঙালি বরাবরই রসিক। বাঙালির খাদ্যরসনার উৎস সন্ধান কল্পে মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্তর্গত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'খাদ্যাভ্যাসের' একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা যেতে পারে। সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'মঙ্গলকাব্য' কেবলমাত্র 'গুনকীর্তণসূচক'[1] বা 'ধর্মীয়' কাব্য রূপে উল্লেখিত হলেও, এর পিছনে যে বৃহৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বর্তমান, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মঙ্গলকাব্যের রচনাকালের পটভূমিকাকে পর্যালোচনা করলেই এর রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতকে চিহ্নিত করা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলায় তুর্কি আক্রমণ এবং ইসলামীয় ধর্মান্তরীকরণ প্রক্রিয়ায় সূত্রপাত ঘটলে, হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এরপর আবার হিন্দুধর্মের বর্ণব্যবস্থায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ক্রমশ মুসলিম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এরফলে গোঁড়া হিন্দু ধর্মের নিয়ন্ত্রণকারীরা নিজ ধর্মের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণের 'অনার্য' দেবদেবীদের ক্রমে হিন্দুধর্মের মূলস্রোতের সাথে সংযুক্ত করতে উদ্যত

হয়। এইরকম বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিস্থিতিতে দেবদেবীদের 'মঙ্গলবার্তা' প্রচারের উদ্দেশ্যেই মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ঘটে।

**আঞ্চলিকতার পরিপ্রেক্ষিতে রন্ধনশৈলীর আর্থ-সামাজিক বিবরণ:** মঙ্গলকাব্যের উত্থানের পিছনে পটভূমিকাকে অনুধাবনের পর প্রয়োজন প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা। বর্তমান আলোচনায় আঞ্চলিকতার নিরিখে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের খাদ্যাভ্যাস বা পাক-প্রনালীর বিবরণ ছাড়াও, খাদ্যাভ্যাসকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক বিভাজনকেও আলোকপাত করা যেতে পারে। উল্লেখিত বিষয়ের উপর রচিত পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঙালির রন্ধনশৈলীকে কাব্যের নিরিখে বিচার করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রন্ধনশৈলীর প্রকারভেদকেও বর্ণনা করা হয়েছে। উৎসা রায়ের ঔপনিবেশিক ভারতে মধ্যবিত্ত বাঙালির 'খাদ্যাসংস্কৃতি'র উপর রচিত গ্রন্থকে আলোচ্য প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তিনি তার রচনায় 'বাঙাল' ও 'ঘটি'র পরিপ্রেক্ষিতে রন্ধনশৈলীর প্রভেদ ছাড়াও, বিভিন্ন অঞ্চলে রচিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের পাক-প্রনালীর বিভাজনকেও বর্ণনা করেন।[২] চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণে কবিদের ব্যাখ্যায় বাংলার রন্ধনশৈলীর বিবরণ পাওয়া যায়। দামিন্যা অঞ্চলের বাসিন্দা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত, তার 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়বঙ্গের রন্ধনশৈলীর বিবরণ প্রদান করেছেন।[৩] প্রধানত উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী ও বর্ণের ভিত্তিতে মুকুন্দরাম বাংলার ব্যঞ্জনের বিভাজন করেছেন।[৪] আলোচ্য প্রসঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে ব্যাধ বধূ নিদয়া এবং বণিক গৃহিণী 'সাধ' ভক্ষণের ব্যঞ্জনগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোকপাত করা অপরিহার্য। ধর্মকেতু পত্নী এবং কালকেতুর মাতা 'নিদয়া' তার গর্ভাবস্থায় স্বামীর নিকটে বিভিন্ন ব্যঞ্জন আহারের সাধ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিবৃতি প্রদান করা প্রয়োজনীয়,

"প্রাণনাথ কাল গর্ভ হইল কোন ফলে
আরুচা করিল বল উদন বেঞ্জন জল
পেটে ভোক নাহি চলে।
*****************************************
আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মীনে জামিনের রস।
নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই
কুলি করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি।
আমার সাধের সীমা ইঙ্গিচা পলতা গিমা
বোয়ালি ঘাঁটিয়া কর পাক
ঘন কাঠি খর জ্বালে সান্তলিবে কটু তৈলে
দিবে তায় পলতার শাক।
পুই ডগি থুপি কচু ফুল বড়ি দিবে কীছু
দিবে তায় মরিচের ঝাল
হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল।
লোণ কিছু নেউল গোধিকা পোড়া
হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া
কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া

সসারদ্ধ করহ শিকপোড়া।
**********************************
মুলাতে বার্তাকু সিম তাহে দিআ রান্ধ নিম
আর দেহ ডম্বুরের ফল।”[৫]

উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে কেবলমাত্র ধর্মকেতুর গৃহের ‘সাধ’ অনুষ্ঠানের পাক-প্রণালীর বিবরণ নয়, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাধের গৃহের রন্ধনশৈলীরও বর্ণনা পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম কর্তৃক গৃহীত নিদয়ার ভোজন তালিকা অনুযায়ী, পোড়া মাছ, মহিদের দই দিয়ে মাখা খই, মিষ্টি ঘোল, পাকা চালতার ঝোল, আঁমসি, হেলেঞ্চা শাক ভাজা, পলতা শাক ভাজা, গিমা শাক ভাজা, বোয়াল মাছের তরকারি, পুঁই শাকের ডগা ও কচু ফুলবড়ি ও লঙ্কার সহযোগে ব্যঞ্জন, পাকা তাল, নেউল ও গোসাপের পোড়া মাংস, হাঁসের ডিম, চিঙ্গড়ির বড়া, শজারুর পোড়া মাংস, সিম নিম ও ডুম্বুরের সহযোগে পদ প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যাধেদের গৃহে যা সহজলভ্য তাই তার খাদ্য তালিকার অন্তর্গত। এরপর খুল্লনার ‘সাধ’ অনুষ্ঠানের ভোজন তালিকা বর্ণনা করলে ব্যাধ ও বণিকের গৃহের খাদ্যাভ্যাসের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজসাধ্য হবে। পতির অনুপস্থিতিতে সতীন লহনা খুল্লনার জন্য অল্প ব্যঞ্জনের আয়জন করলেও, তাদের গৃহের রন্ধনশৈলীতে আভিজাত্যের প্রতিফলন স্পষ্ট। আলোচ্য প্রসঙ্গে কবি মুকুন্দরাম যে পাক-প্রণালীর বিবরণ দিয়েছে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। খুল্লনার ভোজন তালিকা অনুযায়ী,

“আপনার জায় মন জদি পাই সে বেঞ্জন
তবে খাই গ্রাস দুইচারি।
লতা পাতা বন-শাক খরজালে কর‍্যা পাক
সান্তলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা
সন্তলন বলি তিথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
বনি বলি যদি কর দয়া।
নিধানি করিয়া খই অথি দিয়া মস্যা দই
কুলি করঞ্জা প্রাণহেন বাসি
জদি কিছু পাই সুখ আম্রে মসুরের সুপ
প্রাণ পাই পাইলে আমসী।
দেখি জেমন সোনা শকুল মৎস্যের পোনা
গোটা কাসন্দি দিবে তথি
হরিদ্রা-রজিত কাজি উদর পুরিয়া ভুজি
বন-সাকে বড় সুখ তথি।
ঘোলে মিসাইয়া লাউ দুগ্ধ তিলে গুড়ে জাউ
পিঠা কর খির-নারিকেল।”[৬]

আলোচ্য উক্তিতে খুল্লনার সাধ অনুষ্ঠানের রন্ধন প্রণালীর প্রকাশ পাওয়া যায়। জোয়ান ফোঁড়ন দিয়ে বিভিন্ন শাকের পদ, দই দিয়ে খই মাখা, আম ও মুসুরের সুপ (আমডাল), আমসী, কাসুন্দি দিয়ে শোল মাছের ঝাল, লাউয়ের পদ, দুধ, ক্ষীর এবং নারকেল দিয়ে নির্মিত পিঠে প্রভৃতি পদের ব্যাখ্যা মুকুন্দরাম তার কাব্যে প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুকুন্দরামের বর্ণনায় আমিষ ও নিরামিষ উভয় ব্যঞ্জনের ব্যাখ্যা থাকলেও, দ্বিজ মাধব খুল্লনার সাধ অনুষ্ঠানের কেবলমাত্র নিরামিষ পদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেখানে বাথুয়া ও পালঙ্গ শাক ভাজা, মুলো শাক ভাজা, পুঁইশাক তেলাকুচো পাতা দিয়ে নির্মিত পদ, লাউয়ের ব্যঞ্জন, কুমড়োর ব্যঞ্জন, প্রভৃতি নিরামিষ ব্যঞ্জন ও পিঠের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] নিদয়া এবং খুল্লনার উভয়ের গৃহের উৎসবের খাদ্য তালিকা তৎকালীন সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অর্থনৈতিক বিভাজনকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। নিদয়ার খাদ্যতালিকায় যে খাদ্যদ্রব্যের

ব্যাখ্যা রয়েছে, তা মূলতঃ ব্যাধেদের খাদ্যাভ্যাসের অন্তর্গত। এই কারণে তার তালিকায় মাছ, নেউল, গোসাপ ও সজারুর পোড়া মাংসের উল্লেখ রয়েছে। বণিকের গৃহে অবশ্যই এইরকম পদ অপাঙ্‌ক্তেয়। অপরদিকে আবার উভয়ের ভোজন তালিকায় খই ও দই এর উদাহরণ থাকলেও, দুধের বিবরণ শুধুমাত্র খুল্লনার খাদ্যতালিকাতেই পাওয়া যায়। আবার ক্ষীর ও নারকেল সহযোগে পিঠের বর্ণনা কেবলমাত্র বণিক গৃহিনীর ভোজন তালিকার অন্তর্গত। এর মাধ্যমেই মূলতঃ অর্থের নিরিখে পাক-প্রণালীর স্পষ্ট বিভাজন করা যায়।

এখন প্রশ্ন হল, আঞ্চলিকতা নিরিখে রন্ধনশৈলীর প্রভেদ কোন অঞ্চলে কিরকম? বাংলার রন্ধনশৈলীকে অনুধাবন করতে হলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রথমত, রাঢ় বঙ্গের রন্ধনশৈলী অবশ্যই বরেন্দ্রভূমি বা বাংলার উত্তরাংশের থেকে আলাদা। আবার পূর্ববঙ্গের রন্ধনশৈলী অবশ্যই রাঢ় এবং বরেন্দ্রভূমির থেকে পৃথক হবে। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের তুলনায় মুকুন্দরামের কাব্যেই পাক-প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব নিজে বাংলার পশ্চিমাংশের বাসিন্দা হলেও, তিনি পূর্ববাংলার রন্ধনশৈলী ও বিভিন্ন ব্যঞ্জনকে নিজের কাব্যে উল্লেখ করেছেন।[৮] দ্বিজ মাধব খুল্লনার সাধের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাকের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে কেবলমাত্র পালঙ্গ শাক ছাড়া অন্যান্য শাকের উল্লেখ মানিকদত্তের কাব্যে পাওয়া যায় না।[৯] পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মালদা জেলার বাসিন্দা মানিকদত্তের বর্ণনায় নিরামিষ বা সবুজ সব্জির প্রাধান্য বেশী।[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব বাংলায় আবার আমিষ রন্ধনশৈলীর প্রাধান্য বেশী। এই কারণে বোধহয় পূর্ববঙ্গে জনপ্রিয় মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মৎস ও মাংসের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১] মৎসের মধ্যে যেমন রুই, কাতলা, ইলিশ, শোল জনপ্রিয়, অপরদিকে তেমনি রাঢ় বঙ্গে বোয়াল ও ইলিশ মাছ জনপ্রিয়।[১২] অতএব, উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রভেদে বাংলার খাদ্যাভ্যাসের একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

**আর্থিক সঙ্গতির নিরিখে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন:** উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রেণী ও বর্ণের ভিত্তিতে পাক-প্রণালীর বিবরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রসঙ্গের পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে বর্ণের ভিত্তিতে খাদ্যাভ্যাসের বিভাজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফ্রান্স ভট্টাচার্য এবং রাধা শর্মা তাদের প্রবন্ধে নিদয়া এবং খুল্লনার মধ্যে বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের খাদ্যাভ্যাসের বিভাজনকে উল্লেখ করেছেন।[১৩] তবে, বর্তমান প্রবন্ধে আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনকে আলোকপাত করা হয়েছে। 'অর্থনৈতিক সঙ্গতি' যেহেতু একটি অস্থায়ী অবস্থান, তাই উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মধ্যেও ধনী ও দরিদ্রের বিভাজন রয়েছে। শ্রেণী ও বর্ণের নিরিখে সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে চিহ্নিত করাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে ভিক্ষুক বেশধারী শিবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। মুকুন্দরাম শিবের অন্তরের প্রশস্তিকে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যেই তার এই রূপকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে, বর্তমান আলোচনার স্বার্থে শিবের ভিক্ষুক রূপকেই উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হিমালয় পত্নী মেনকা নিজ কন্যা পার্বতীকে দীর্ঘদিন পিতৃগৃহে অবস্থানের কারণে অবমাননা করলে, সে শিবের কাছে পতিগৃহে যাওয়ায় আগ্রহ প্রকাশ করে।[১৪] শিব কর্মহীন এবং কৃষিকার্যে অনিচ্ছুক।[১৫] সংসার প্রতিপালনের জন্য তাই ভিক্ষাবৃত্তিই[১৬] তাঁর একমাত্র উপায়। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজনঃ

"ভ্রমেন উজানি তাটি চৌদিকে কোঁচের বাটী
কোঁচ-বধূ ভিক্ষা দেই থালে
থাল হইতে চালগুলি পুরিআ এড়েন ঝুলি
দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে।
কেহ দিল চালু কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি
কুঁপি ভরি তৈল দিল তেলি
লবনিঞা দিল লোন ঘৃত দধি গোপগণ
বান্যা দেই ভাঙ্গের পুটুলি।

ময়রা মুড়কি দেই সূত্রধরে দেই খই
তামুলিতে দেই গুআ পান।”[১৭]

উল্লেখিত উক্তি অনুযায়ী, শিব উজানি নগরের কোচ রমণীর কাছ থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে। কোচ প্রধানত উত্তর বঙ্গের হিন্দু উপজাতি।[১৮] মুকুন্দরাম রাঢ় বঙ্গের বাসিন্দা। তবে, তার কাব্যে কোচ উপজাতির উল্লেখ থাকায় রাঢ় বঙ্গের কিছুটা অংশে কোচ উপজাতির অবস্থানকে অনুমান করা যেতে পারে। শিব উজানি অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে কি কি দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করছেন, তা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। কোচ বধূ তাঁকে যেমন চাল প্রদান করেন। আবার কেউ কেউ কড়ি, ডাল, বড়ি প্রভৃতি প্রদান করেন। অর্থনৈতিক সঙ্গতি না থাকলে কারোর পক্ষে চাল, কড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। নুনের ব্যবসায়ী তাঁকে নুন, তেল ব্যবসায়ী তাঁকে দিল তেল, গোয়ালা দিল ঘি ও দই, বণিক দিল ভাং, ময়রা দিল মুড়কি, সূত্রধর দিল খই, এবং পান বিক্রেতা দিল পান। অর্থাৎ শিবের পূজার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সামগ্রী প্রয়োজনীয় মুকুন্দরামের কাব্যে ভিক্ষার ছলে মহাদেব তা গ্রহণ করে। মুকুন্দরামের কাব্যে ছলনা থাকলেও এর মাধ্যমে ভিক্ষা প্রদানকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়। উল্লেখিত ভিক্ষা প্রদানকারীদের কাছে যে জিনিসের আধিক্য বেশী, তারা সেটাই ভিক্ষা হিসাবে প্রদান করে। এর মাধ্যমে লবন, তেল, ঘি, দই, কড়ি, ভাং প্রভৃতি প্রদানকারীদের আর্থিক সঙ্গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম থাকলে, তাদের পক্ষে দান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। অতএব, বিভিন্ন পেশা নির্ভর শ্রেণীর মধ্যে অর্থের ভিত্তিতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে এর মাধ্যমে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

উল্লেখিত প্রসঙ্গে ব্যাধ বৃত্তি অবলম্বনকারী কালকেতুর আর্থিক সঙ্গতিকে নির্ণয় করা প্রয়োজন। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধের গৃহে চিরন্তন দৈন্য দশার[১৯] উল্লেখ থাকলেও, মুকুন্দরাম তার কাব্যে প্রথমদিকে শিকারে পটু কালকেতুর আর্থিক সঙ্গতির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে,

“পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।
মুচুড়িয়া গোফ দুটা বাঁন্ধে নিঞা ঘাড়ে
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।
বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি-কচু ঘণ্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।
অম্ল খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে
রন্ধন কর্যাছ ভাল আর কীছু আছে।
আনিঞাছি হরিণ দিয়া দধি এক জাড়ি
তাহা দিয়া খাও বীর ভাত তিন হাঁড়ি।”[২০]

আলোচ্য উক্তিতে মুকুন্দরাম কালকেতুর খাদ্যাভ্যাসের যে বিবরণ দিয়েছেন, এর মাধ্যমে তার সচ্ছল অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তার খাদ্যাভ্যাসে আমন ধানের ভাত ছাড়াও, খুদের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তার সংসারে চাল ও খুদ উভয়েই বাড়ন্ত নয়। এছাড়া খুদ যেহেতু দরিদ্রের খাদ্যতালিকার প্রধান উৎস, মুকুন্দরামের কাব্যে হয়তো সেই কারণে খুদের উল্লেখ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া লাউ ডাল, আলু, ওল পোড়া, আমড়া ও করঞ্জা মিশিয়ে কচুর ঘণ্ট, যা মূলতঃ ব্যাধেদের প্রাত্যহিক আহারের অন্তর্গত, তা কাব্যে বর্ণিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কালকেতু

আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণ পাওয়া যায় তার হরিণের বিনিময়ে দই কিনে আনার বিষয়ে। এছাড়াও সে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী এতো বিস্তর পরিমাণে গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে তার সচ্ছল অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচত মেলে। অর্থাৎ সে ব্যাধেদের মধ্যে আর্থিক দিক থেকে সঙ্গত। এরপর অভয়ায় মায়ায় কালকেতু পশু শিকারে ব্যর্থ হলে তার আর্থিক অসঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শিকারী কালকেতু শিকার না পেয়ে গৃহে ফিরে এলে তার বধূ ফুল্লরা প্রতিবেশীর থেকে খুদ সংগ্রহে ব্রতী হন।[২১] এর সাথে সে লবন দিয়ে শাক রান্না করারও প্রস্তুতি নেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কালকেতুর সংসারে একসময় পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ ছিল। এমনকি দই খাবারেরও বিলাসিতা ছিল। সেই পরিবারে এখন আর্থিক অনটন স্পষ্ট। অপর একটি প্রসঙ্গ হল, যে ব্যক্তি খুদ প্রদান করছে, সে নিশ্চয় ব্যাধেদের মধ্যে আর্থিকভাবে সচ্ছল। অতএব, একটি নির্দিষ্ট বর্ণের মধ্যের ধনী ও দরিদ্রের বিভাজনকে এর মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।

অনুরূপভাবে, বণিকশ্রেষ্ঠ ধনপতিও সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কাব্য অনুযায়ী,

“ ধনপতি হইল বন্দী নপৃতির ঘরে
ভিক্ষে জিয়ে নায়্যা পাইক সিংহল নগরে।
সেই জন হইল শত লক্ষ অধিকারী
সিঙ্গহলে আসিয়া হইল কড়ার ভিখারি।
সমস্ত দিবস ভিক্ষা করিয়া সিংহলে
একস্থানে উপস্থিত হয় সন্ধ্যাকালে।
সাধুর পাচক দ্বিজ করয়ে রন্ধন
সভাকার আগে ধনপতির ভোজন
**********************
কোনদিন লোন মিলে কোন দিন তেল
************************
দুর গেল খির খণ্ড ঘৃত গুয়াপান
খুধা পাইলে সাধু তণ্ডুল চিবান।”[২২]

আলোচ্য প্রসঙ্গে বলা অপরিহার্য যে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেও বণিক কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারাই তার রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন করেছেন। এর মাধ্যমে একটি বর্ণভিত্তিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন উচ্চবর্ণের মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হলেও, সে তার জাত্যাভিমানকে বজায় রাখতে ইচ্ছুক। এছাড়াও অর্থের অভাবে ধনপতি বণিকের প্রাত্যহিক আহারের সামগ্রী ব্যাহত হলেও, সে নিম্নবর্ণের কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেনি। সে প্রয়োজনে সুপারি চিবিয়ে খেয়ে নিজে ক্ষুধা নিবারণ করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের খাদ্যাভ্যাসের বিবরণকে অর্থনৈতিক বিভাজনের প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন বর্ণভিত্তিক বিভাজনকে অনুধাবন করা যায়, অপরদিকে তেমনি আর্থিক সঙ্গতির পরিপ্রেক্ষিতে একই বর্ণের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের বিভাজনকেও চিহ্নিত করা যায়। এরপর আবার আঞ্চলিকতার নিরিখে বিভিন্ন অঞ্চলের রন্ধনশৈলীরও বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশেষে বলা প্রয়োজন যে, আর্থিক এবং বর্ণের ভিত্তিতে সমাজে খাদ্যাভ্যাসের বিভাজনের সাথে, একই বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তরের খাদ্যতালিকার বৈষম্যও প্রকট।

**তথ্যসূত্র:**

১. Dimock, Edward C. (Jr.), “The Goddess of Snake in Medieval Bengali Literature”, *History of Religions*, Vol. 1, No. 2, 1962, pp.307-321.

২. Ray, Utsa, *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Delhi, Cambridge University Press, 2015, pp. 192-205.
৩. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম), পৃঃ ১-৫।
৪. Ray, Utsa, *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Delhi, Cambridge University Press, 2015, p. 196.
৫. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম), পৃঃ ৩৯।
৬. *তদেব্*, পৃঃ ২০৯-২১০।
৭. ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীভূষণ (সম্পা), *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ (প্রথম), পৃঃ ২১৩-২১৪।
৮. Ray, Utsa, *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Delhi, Cambridge University Press, 2015, pp. 198.
৯. তদেব্, পৃঃ ১৯৯।
১০. তদেব্।
১১. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম)।
১২. Ray, Utsa, *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Delhi, Cambridge University Press, 2015, pp. 199.
১৩. Bhattacharya, France and Sharma, Radha, “Food Rituals in the Chandi Mangala”, *India International Centre Quarterly*, Vol. 12, No. 2, Food Culture, June 1985, pp. 169-192.
১৪. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম), পৃঃ ২৪-২৫।
১৫. তদেব্।
১৬. তদেব্।
১৭. তদেব্, পৃঃ ২৫।
১৮. Bhattacharya, France and Sharma, Radha, “Food Rituals in the Chandi Mangala”, *India International Centre Quarterly,* Vol. 12, No. 2, Food Culture, June 1985, p. 173.
১৯. ওঝা, শ্রীসুনীল কুমার, মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, পি-এইচ,ডি, (কলা-শাখা) ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১, পৃঃ ৬২-৭০।
২০. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, নয়া দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম), পৃঃ ৪৫।
২১. তদেব্, পৃঃ ৫৪।
২২. তদেব্, পৃঃ ২০৮-২০৯।

**গ্রন্থপঞ্জী:**

আকর গ্রন্থঃ

১. ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীভূষণ (সম্পা), *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৫২ (প্রথম)।

২. সেন, সুকুমার (সম্পা), *কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লী, বৈশাখ ১৩৮২ (প্রথম)।

সহায়ক গ্রন্থঃ

1. Ray, Utsa, *Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle Class*, Cambridge University Press, Delhi, 2015.

সহায়ক প্রবন্ধঃ

2. Bhattacharya, France and Sharma, Radha, “Food Rituals in the Chandi Mangala”, *India International Centre Quarterly,* Vol. 12, No. 2, Food Culture, June 1985.

3. Dimock, Edward C. (Jr.), “The Goddess of Snake in Medieval Bengali Literature”, *History of Religions*, Vol. 1, No. 2, 1962.

সহায়ক পিএইচডিঃ

১.ওঝা, শ্রীসুনীল কুমার, মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, পি-এইচ,ডি, (কলা-শাখা) ডিগ্রিলাভের জন্য প্রদত্ত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।